DEC. -3 2003
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ...

৭ম ঢাকা বইমেলা প্রসঙ্গে

এন. এম. পনিরউদ্দিন হায়দার
পরিচালক, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র

সৌন্দর্যের অনুভূতিকে অস্তিত্বময় করে তুলতে জ্ঞানের প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের সব সীমাবদ্ধতাকে ভেঙ্গে দিয়ে অন্তর্নিহিত সামগ্রিক অভিব্যক্তিকে ক্রিয়াময় করে তুলতে মাত্র একখানা ভালো বই-ই যথেষ্ট। আমাদের চেতনা ও বোধের মধ্যে অনিবার্যভাবে মূর্ত হয়ে ওঠে মানবিক মূল্যবোধ। আমাদের হাজার বছরের সংস্কৃতিকে আমরা লালন করেছি আমাদের মেধা ও মনন দিয়ে। ক্রমশ আমাদের পাঠ ও প্রত্যাশার দিগন্ত উন্মুক্ত হয়েছে। বুদ্ধিবৃত্তি ও জ্ঞানচর্চা তখনই সম্ভব যখন একজন ব্যক্তি পরিপূর্ণভাবে শিক্ষিত একজন মানুষ হয়ে ওঠে। আমি বিশ্বাস করি জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে বই-ই একমাত্র মাধ্যম। বইয়ের বিকল্প বই এ কথা অনস্বীকার্যভাবে সত্য।

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র দেশের গ্রন্থোন্নয়নের জন্য দীর্ঘদিন থেকে কাজ করে আসছে। প্রকাশনা শিল্পের প্রতিটি ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদানসহ গ্রন্থোন্নয়নের জন্য নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। দেশে পাঠাগার উন্নয়ন, জাতীয় পর্যায়ে গ্রন্থমেলা, স্থানীয়ভাবে গ্রন্থপ্রদর্শনী, প্রকাশনা বিষয়ক নানাবিধ প্রশিক্ষণ এবং জাতীয় গ্রন্থনীতি প্রণয়ন, গ্রন্থবিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠান, গ্রন্থপঞ্জি প্রকাশসহ উল্লেখযোগ্য কাজ জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র করে থাকে।

এবারের বইমেলার মূল থিম 'মাতৃভাষা বিকাশের জন্য বই'। মাতৃভাষা বিকাশকে অতিদ্রুত ফলপ্রসূ করার জন্য একজন মেধাসম্পন্ন লেখকের পাশাপাশি একজন ভাল প্রকাশকের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে আমি মনে করি। একজন লেখক ও প্রকাশকের যোগাযোগের জন্য বইমেলাও একটি মাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। সর্বোপরি গ্রন্থোন্নয়নকে সফলভাবে কার্যকর করতে হলে সম্মিলিত মেধাকে কাজে লাগানোর প্রয়োজন রয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি।

ঢাকা বইমেলা প্রসঙ্গে

মহিউদ্দিন আহমেদ
প্রকাশক, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড (ইউপিএল)

ঢাকা বইমেলা তার ৭ম বর্ষে পদার্পণ করল। এই মেলা দিনে দিনে আন্তর্জাতিক বই মেলাতে রূপান্তরিত হবে এই আশা নিয়েই ১৯৯৫ সালে ঢাকা বইমেলার প্রবর্তন করা হয়েছিল। সে আশা করার সঙ্গত কারণও আছে। বার কোটি মানুষের এই দেশে আমাদের ব্যক্তিক ও সামষ্টিক উন্নয়নে উচ্চ শিক্ষায় নিয়োজিত শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের, গবেষকদের, পেশাজীবীদের সর্বাধুনিক ধ্যান-ধারণা, তত্ত্ব ও জ্ঞানের সঙ্গে সদা পরিচিত থাকতে হয়। কিন্তু বই কোথায়? বাজারে আমদানীকৃত যে সব বই দেখি সেগুলোর বেশির ভাগই কারিকুলামে নির্দেশিত ও বহুল পরিচিত এবং ক্ষেত্র বিশেষে পুরাতন বই। আবার আমাদের দেশের অধিকাংশ সচেতন মানুষ-বই যাঁদের খুবই দরকার এবং যাঁরা প্রয়োজনে বই লিখবেন তাঁদের সঙ্গেও গ্রন্থ জগতের পুরোপুরি পরিচয় ঘটে না। আন্তর্জাতিক বই মেলা হলে দেশ বিদেশের প্রকাশকরা তাঁদের সর্বাধুনিক প্রকাশনা নিয়ে আমাদের সামনে হাজির হবে। বই যে কত ধরনের হতে পারে, কত বিষয়ের হতে পারে, কত ভাবে বইকে পাঠকের কাছে উপস্থাপন করা যেতে পারে তা আন্তর্জাতিক বইমেলা না দেখলে অনুমান করাও কঠিন। আন্তর্জাতিক বইমেলা হলে দেশের মানুষ বই দেখার, যাচাই করার এবং প্রয়োজনে সংগ্রহের ব্যবস্থা নিতে পারবেন। এর ফলে গড়ে উঠবে সৃষ্টিশীল সচেতন পাঠকগোষ্ঠী, যাদের হাতেই কিনা রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দায়িত্ব। ঢাকা বইমেলাকে ঐ স্তরে উন্নীত করতে পারলে সেটাই হবে সত্যিকারের দেশ গড়ার লক্ষ্যে একটি অন্যতম প্রধান কাজ। স্বভাবতই মনে হতে পারে যে, এই ধরনের মেলায় শিক্ষা, গবেষণা, বিজ্ঞান, কারিগরী ও অর্থনীতির মত বিষয়গুলোই প্রাধান্য পাবে, কিন্তু সে আশঙ্কা করার কোন কারণ নেই। শিল্প, সাহিত্য, বিশেষ করে শিশুতোষ গ্রন্থ, আন্তর্জাতিক গ্রন্থমেলায় অত্যন্ত কাঙ্ক্ষিত ও মুখ্য উপকরণ।

পৃথিবীর সকল উন্নত দেশই শিশুদের জন্যই সর্বাধিক বিনিয়োগ করে ভবিষ্যতের প্রত্যাশায়। তাই ঐ দেশগুলিতে বিভিন্ন ভাষায় শিশুদের মনের বিকাশ ঘটানোর জন্য হাজার হাজার বই প্রকাশিত হয়। কিন্তু আমাদের কাছে সে সবের খবর আসে না এবং সে সব বইয়ের সংস্পর্শে আসার সুযোগ থাকে না। তাই শিশু ও কিশোরদের কাছে কত বিষয় কতভাবে উপস্থাপন করা যায় তার উদাহরণ আমাদের কাছে নেই। আমরা শিশু কিশোরদের জন্য ক্লাসিক কিছু বইয়ের সন্ধান জানি, যেগুলি পড়ি, অনুবাদ, ভাষান্তর ও রূপান্তর করি। অনুপ্রেরণা, উদাহরণ ও অনুশীলনের অভাবে আমরা শিশু কিশোরদের কাছে যে সব বই নিয়ে পৌঁছাই, এমনকি সৃষ্টিশীল সাহিত্য বলে কথিত বইয়ের অধিকাংশই হয় পুনরাবৃত্তি, নতুন বোতলে পুরানো মদ ঢালার মত ব্যাপার।

ঢাকায় আন্তর্জাতিক বইমেলা হলে আমাদের শিশু কিশোররা হাজার হাজার নতুন বইয়ের সান্নিধ্যে আসবে, সান্নিধ্যে আসবেন লেখক, অনুবাদক ও প্রকাশকরাও। সব সময় মনে রাখতে হবে যে, বই রচনার যে আর্ট তাকে পঠন-পাঠন, অনুশীলনের মাধ্যমেই আয়ত্ত করতে হয়। প্রচুর বইয়ের সংস্পর্শে এলেই নতুন চিন্তা-ভাবনা ও সৃষ্টির সুযোগ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু কথা হলো, ঢাকা বইমেলা আন্তর্জাতিক বইমেলার লক্ষ্য সাধনে বেশ পিছিয়ে পড়েছে। যে কোন মেলার জন্য চাই একটি নির্দিষ্ট স্থান, নির্দিষ্ট তারিখ। কারণ যাঁরা বিদেশ থেকে বইমেলায় যোগদান করেন তাঁরা তাঁদের ক্যালেন্ডারে অনেক আগে থেকে কোথায় কোন মেলায় যাবেন তা নির্দিষ্ট করে নেন। মেলায় বিদেশী প্রকাশকদের আকর্ষণ করার জন্য এটার বিকল্প নেই। কিন্তু ঢাকা বইমেলার স্থান ও তারিখ এখনও চূড়ান্তভাবে স্থির করা যায়নি, প্রতি বছরই তা পাল্টাচ্ছে। ফলে কোন নামীদামী প্রকাশক এই বই মেলায় যোগদান করতে পারছেন না।

এর পরের প্রসঙ্গটি হচ্ছে খুচরা ক্রেতার কাছে সরাসরি বই বিক্রির বিষয়টি। আন্তর্জাতিক বইমেলায় খুচরা ক্রেতাদের কাছে সরাসরি বই বিক্রি করা হয় না। কোন বিদেশী প্রকাশকের পক্ষে এই ব্যবস্থা নেয়া প্রায় অসম্ভব। তাঁর পক্ষে আগাম অনুমান করা সম্ভব নয় কোন বই কত কপি কোন মেলায় বিক্রি হতে পারে। এছাড়া বই পরিবহনের ব্যয়ও যথেষ্ট। বই বিক্রি না হলে সেগুলি আবার ফেরত নেয়া ও বিক্রিত বইয়ের মূল্য বৈধভাবে নিজ দেশে নিয়ে যাওয়া বেশ সময়সাপেক্ষ ও ঝামেলার কাজ। তাঁরা বইমেলায় আসেন প্রধানত বইয়ের চাহিদা নিরূপণ করতে এবং স্থানীয় প্রকাশক, পুস্তক বিক্রেতাসহ বিভিন্ন পেশাজীবীদের সঙ্গে ভবিষ্যতের ব্যবসা নিয়ে আলাপ করতে, সম্ভব হলে চুক্তিতে উপনীত হতে। যেমন ধরা যাক, দেখা গেল কোন একটি বইয়ের বাংলাদেশে দেড় দু'হাজার কপি বিক্রির সুযোগ আছে। মেলায় যোগদানকারী প্রকাশক তখন খুঁজবেন এমন কোন বই আমদানীকারককে যিনি ঐ বই আমদানী করবেন। হয়তো ঐ প্রকাশক দেখলেন স্থানীয় এমন কোন প্রকাশককে যিনি ঐ বইয়ের দেশীয় স্বত্ব কিনে এখানেই প্রকাশ করতে চান। তাঁর পোষালে তিনি হয়তো ঐ প্রকাশকের সঙ্গেই একটি বাণিজ্যিক লেনদেনে চলে যাবেন। আন্তর্জাতিক বইমেলায় পাইকারী ক্রেতার সন্ধান ছাড়াও এভাবে অনুবাদ স্বত্ব, চলচ্চিত্র স্বত্ব, স্থানীয়ভাবে প্রকাশনার স্বত্ব ইত্যাদি নানান বিষয়ে ব্যবসায়িক লেনদেন সম্পন্ন হয়। এখানেও আমরা বিদেশী প্রকাশকদের জন্য খুব একটা আকর্ষণীয় অবস্থানে উন্নীত হতে পারিনি। উপরোক্ত ধরনের বড় মাপের ব্যবসায় সুযোগ না থাকলে বিদেশ থেকে এসে থাকা, খাওয়া, যাতায়াত ও স্টলের জন্য প্রচুর ব্যয় করেও কোন বিদেশী যোগদানকারীর কোন লাভই হবে না।

আন্তর্জাতিক বইমেলায় দেশী বিদেশী বইয়ের প্রচার-প্রসার বিক্রির সুযোগের পাশাপাশি দেশীয় বইয়ের আন্তর্জাতিক বাজারের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের বইয়ের মান ও চাহিদা আন্তর্জাতিক স্তরের হলে, ঐ বই নিজ নিজ দেশে আমদানী, দেশীয় প্রকাশনা স্বত্ব ক্রয়, বা অনুবাদ করে লাভের সুযোগ থাকলে সে বিষয়েও আন্তর্জাতিক লেনদেন হয়। আমার মতে ঐ ব্যাপারে বাংলাদেশের প্রকাশনা অনেক পিছিয়ে আছে।

ঢাকার বইমেলাকে আন্তর্জাতিক মেলার স্তরে উন্নীত করা কেন জরুরী সে কথা এ নিবন্ধের শুরুতে বলেছি। অর্থনৈতিকসহ দেশের সার্বিক উন্নয়নে একই সঙ্গে দেশের শিশু কিশোরসহ সর্বস্তরের মানুষের বিনোদনের জন্য এবং শিক্ষা, জ্ঞান, দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য চাই প্রচুর মুদ্রিত উপকরণ। ঐ সব উপকরণের সংস্পর্শে না এসে স্বকপোলকল্পিত ধারণা, সীমিত শিক্ষা ও দক্ষতা দিয়ে আমরা বাজারের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদা কিছুতেই মেটাতে পারব না। পরিকল্পিতভাবে জনগোষ্ঠীকে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারব না। আমাদের জনগোষ্ঠীর বৃহদাংশ প্রজন্মের পর প্রজন্ম সুযোগের ও সান্নিধ্যের অভাবে ব্যক্তিক ও ব্যষ্টিক উন্নয়নের কোন ভূমিকাই রাখতে পারেনি। 'তৃতীয় বিশ্বের দেশ' এই কলঙ্ক তিলক নিয়েই আমাদের বসবাস ও বিশ্বের কাছে পরিচিত হতে হচ্ছে। আজ হোক কাল হোক এই দুষ্টচক্র থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতেই হবে। আর ঐ আকাঙ্ক্ষা পূরণের লক্ষ্যে ঢাকা বইমেলাকে আন্তর্জাতিক বইমেলার স্তরে উন্নীত করা কেবল জরুরী নয়, আমাদের সবারই কর্তব্য।

এবার শেষ করি মাতৃভাষায় বই প্রকাশের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বইমেলা কি উপকারে আসতে পারে সেই প্রসঙ্গে। এ নিবন্ধের বিভিন্ন জায়গায় সে বিষয়ে আভাস দেয়া হয়েছে। দেশজ উপাদান মাতৃভাষায় বই রচনার অন্যতম একটি উৎস। কিন্তু পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের তাল মিলিয়ে সব দিক থেকে অগ্রসর হতে হবে। জ্ঞান, বিজ্ঞান, তথ্য, শিল্প ও সাহিত্যের নতুন নতুন বিষয় ও ফরম সম্পর্কে অবগত হবার জন্য পৃথিবীর তথ্যভাণ্ডারে আমাদের প্রবেশ করতে হবে, আয়ত্ত করতে হবে উপস্থাপনা কৌশল ও কারিগরী দক্ষতা। চোখের সামনে উদাহরণই আমাদের খুলে দিতে পারে সেই জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার। আমাদের দেখতে হবে, জানতে হবে এবং অতঃপর আয়ত্ত করে পরিশীলিতভাবে প্রয়োজন অনুযায়ী পাঠকের কাছে তথ্য, জ্ঞান, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিল্পকে উপস্থাপন করতে হবে। তবেই বইয়ের মাধ্যমে জ্ঞান, বিজ্ঞান, তথ্য, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপস্থাপনা পাঠকের কাছে একটি অফুরন্ত উৎস হিসাবে পরিগণিত হবে। প্রকাশনা শিল্প বিকশিত হবে, তার সঙ্গে বিকশিত হবে দেশের সকল জনগোষ্ঠী।

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের কার্যক্রম (১৯৯৯ থেকে ২০০০)

মোঃ শফিকুল ইসলাম, উপ-পরিচালক, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র

১। **ঢাকা বইমেলা** : ৬ষ্ঠ ঢাকা বইমেলা ১৯৯৯: ঢাকা শহরের শেরে বাংলা নগরের মেলার মাঠে ২-১৬ ডিসেম্বর ১৯৯৯ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ ঢাকা বইমেলায় দেশী এবং বিদেশীসহ মোট ১১০টি প্রকাশনা সংস্থা অংশগ্রহণ করে। এ মেলার মূল প্রতিপাদ্য ছিল 'মানবিক উন্নয়নে বই' এবং শ্লোগান ছিল 'বিকশিত জীবনের জন্য বই',

২। **বিষয়ভিত্তিক বইমেলার আয়োজন**: জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ২৪তম এবং ২৫তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর উপর রচিত গ্রন্থের প্রদর্শনী ১৫ আগস্ট জাতীয় শোকদিবসে ১৯৯৯ এবং ২০০০ সালে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র জাতীয় যাদুঘরে আয়োজন করে।

৩। **ভ্রাম্যমাণ বইমেলার আয়োজন**: জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের বুক ভ্যানের মাধ্যমে এ অর্থবছর ঢাকার কমলাপুর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এবং ৯ ও ১০ এপ্রিল ২০০০ তারিখ ঢাকার কিংসু আতাউল হক স্মৃতি পাঠাগার প্রাঙ্গণে ১২-১৩ এপ্রিল ২০০০ তারিখে এ দু'টি ভ্রাম্যমাণ বইমেলা জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ মেলায় আগ্রহী স্থানীয় প্রচুর গ্রন্থানুরাগীর সমাবেশ ঘটে।

৪। **সেমিনার অনুষ্ঠান** : ১৯৯৯-২০০০ সালে মোট ৫টি বিষয়ের উপর সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারের বিষয়বস্তুসমূহ ঃ ১। মানবিক উন্নয়নে বই; ২। প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য বই ও শিক্ষা উপকরণ; ৩। শিক্ষার উন্নয়নে পাঠাগার ও সৃজনশীল বইয়ের ভূমিকা; ৪। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস: আমাদের অর্জন ও দায়িত্ব; ৫। গ্রন্থনীতি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া; দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ ও আশু করণীয়।

৫। **প্রশিক্ষণ কর্মশালা** : জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের উদ্যোগে ডিউই দশমিক শ্রেণীকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা ১১-১৯ জুন ২০০০ পর্যন্ত জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। দেশের বিভিন্ন পাঠাগারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ১৯জন গ্রন্থাগারিক এ প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের প্রশিক্ষকদের সাহায্যে এ প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত হয়।

৬। **জরিপ কর্মসূচি**: ১৯৯৯-২০০০ অর্থসালে ২টি বিষয়ের উপর জরিপ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ১। দেশের প্রাচীন পাঠাগারসমূহের তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ; ২। শিশু কিশোরদের মধ্যে পাঠাভ্যাসের আগ্রহ সৃষ্টিতে অভিভাবক এবং শিক্ষকদের ভূমিকা;

৭। **বেসরকারী পাঠাগারসমূহে রাজস্ব খাতের অনুদানের অর্থ ও বই বিতরণ**: জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের বিক্রয় বিভাগ থেকে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারী পাঠাগারসমূহকে অনুদানের নগদ অর্থ এবং বই নিয়মিত ছাড় করে থাকে।

১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে (যা ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে বিতরণ করা হয়েছে) মোট অর্থের পরিমাণ ৬৫,০০,০০০/- টাকা, নগদ ৩২,৫০,০০০/- টাকা এবং বই বাবদ ৩২,৫০,০০০/- টাকা। মোট অনুদানপ্রাপ্ত পাঠাগারের সংখ্যা ৭০৬।

৮। জেলা ও থানা পর্যায়ে বেসরকারী গণগ্রন্থাগার উন্নয়ন সহায়তা প্রদান (২য় পর্যায়ে) প্রকল্পের মাধ্যমে ১৯৯৯-২০০০ সালে ১৮১ টি গণগ্রন্থাগারে অবকাঠামো আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম ও পুস্তক বাবদে ৭০.০০ লক্ষ টাকা অনুদান বাবদ বিতরণ করা হয়েছে। উপর্যুক্ত অনুদানকৃত অর্থের মধ্যে ৫০% অর্থের বই আর বাকী ৫০% অর্থ গণগ্রন্থাগারসমূহে চেকের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

৯। **মহানগর পাঠাগার থেকে পাঠসেবা প্রদান**: অন্যান্য বছরের মত '৯৯-২০০০ অর্থসালেও প্রচুর পাঠ উৎসাহী ব্যক্তি এ পাঠাগার থেকে পাঠ সেবা নিয়েছেন। বর্তমানে এ পাঠাগারে দেশী বিদেশী দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থসহ ৭ হাজারের মত বই পাঠের জন্য রয়েছে। এই পাঠাগারে বই ছাড়া দেশের প্রায় সব জাতীয় দৈনিক পত্রিকাসহ বিদেশী উল্লেখযোগ্য ম্যাগাজিন পাঠকদের জন্য রাখা হয়।

১০। **জাতীয় গ্রন্থনীতি বাস্তবায়ন**: জাতীয় গ্রন্থনীতি প্রণয়নে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র সার্বিক দায়িত্ব পালনসহ এ নীতি প্রণয়নে সকল সুযোগ সুবিধা প্রদান করে। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র জাতীয় গ্রন্থনীতি বাস্তবায়ন সেল নামে একটি স্থায়ী সেল গঠন করেছে।

১১। **সৃজনশীল বই সরকারি ও বেসরকারি কলেজে বিতরণ কর্মসূচি সম্পাদন**: জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র ১৯৯৯-২০০০ অর্থসালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তিন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকার অনুদানকৃত সৃজনশীল বই ৭১৯টি সরকারী ও বেসরকারী কলেজে বিতরণ করে। এ কর্মসূচি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সরকারি ও বেসরকারি কলেজে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠাভ্যাসে উৎসাহিত করার জন্য একটি উত্তম কর্মসূচি।

এছাড়াও জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র বাংলাদেশের বই নিয়ে আগস্ট'৯৯-এ **দিল্লী বই মেলায়**, ফেব্রুয়ারি ২০০০-এ **দিল্লী বিশ্ব বইমেলায়**, জানুয়ারি-২০০০-এ **কলিকাতা পুস্তক মেলায়** অংশগ্রহণ করে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রকাশিত বই নিয়ে ফেব্রুয়ারি ২০০০-এ অনুষ্ঠিত **অমর একুশে বই মেলায়** অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশে প্রকাশিত চলতি বইয়ের তালিকা **গ্রন্থপঞ্জি ২০০০, মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপঞ্জি ও বই পত্রিকার** ৪টি সংখ্যা প্রকাশ করেছে। **গ্রন্থের উন্নতমানের মুদ্রণ, অঙ্গসৌষ্ঠব, অলংকরণ ও শ্রেষ্ঠ প্রকাশনার** জন্য ১৯৯৯ সালের পুরস্কারপ্রাপ্তদের মধ্যে অভিজ্ঞান পত্র ও নগদ অর্থ প্রদান করা হয়েছে।

এমনি বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র দেশের সর্বস্তরের মানুষকে গ্রন্থমনস্ক করার লক্ষ্যে দেশের প্রকাশনা শিল্পকে সমৃদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। গ্রন্থোন্নয়নের পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত। গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি থেকে শুরু করে মুদ্রণ, প্রকাশনা বিপণন, সংরক্ষণ ও পাঠের মাধ্যমে গ্রন্থজীবন আবর্তিত হয়ে থাকে এবং এ গ্রন্থ মানবজীবনের বিস্তৃত পরিমণ্ডলের উন্নয়নের সহায়ক। এ বিষয়ে সম্যক ধারণা রেখেই জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র তার ব্যাপক ও বিস্তৃত কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের গ্রন্থোন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে চেষ্টা করছে। দেশের গ্রন্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যেকোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ১৯৯৯-২০০০ অর্থ সালের কার্যক্রমে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের এ ভূমিকার কথা আশা করি নির্দ্বিধায় স্বীকার করবেন।